বকের সঙ্গে বকবক

সুব্রত রায়

ইডেনে বাংলা অসমের খেলা চতুর্থ দিন বিকেল চারটার সময় শেষ হয়ে গেলো। একসময় ছুটির দিনে শীতের দুপুরে ময়দানে মাঠে মাঠে ঘুরে ক্রিকেট খেলা দেখতাম। আজ তা অতীত। সন্ধ্যা হতে কিছুটা সময় বাকি আছে। অনেক দিন পর ময়দানে এলাম, ভাবলাম ময়দানে এক চক্কর দেওয়া যাক।

এ-মাঠ ও-মাঠ করতে করতে খেয়াল নেই কখন যে মনোহর দাস তড়াগের পিছনে হাজির হয়েছি। পুকুরের পাশ দিয়ে সরু একটা পায়ে চলার রাস্তা। সেটা এসে মিশেছে চৌরঙ্গীর ফুটপাতে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত গলায় শুনতে পেলাম - প্রহরঃ কিম্? এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। আবার আস্তে আস্তে হাঁটা সুরু করলাম। এবার পরিষ্কার বাংলায় শুনলাম - কটা বাজে হে? ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমার থেকে হাত কুড়ি দূরে বড় গাছের তলায় একটা বক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বক বললো - কি চুপ করে আছো কেন? কটা বাজে বলতে পারছো না? আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো - আরে বাস বক কথা বলে। বকটা হা হা করে হাসতে হাসতে বললো - আমি এক বিশেষ প্রজাতির বক। আমার জাতভাইরা সকলেই কথা বলে। আমাদের আয়ু বিশ হাজার বছরেরও বেশি। আমি বললাম - এমন কথা তো আগে কখনও শুনিনি। জীববিজ্ঞানের বইতে কেউ এর উল্লেখ করেনি। তবে মহাভারতে এক বকের কথা আছে। সে আবার খুব পণ্ডিত বক। নানা বিষয়ে তার জ্ঞান। বিশেষত দর্শন শাস্ত্রে। অবশ্য হবে না বা কেন? সে তো স্বয়ং ধর্মরাজ। বক বললে - তুমি যে বকের কথা বলছো আমি সেই অধম। আমি বললাম - ধর্মরাজ আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। বক বললে - আমি মোটেই ধর্মরাজ নই। তবে তোমার প্রণাম গ্রহণ করলাম। তোমার মঙ্গল হোক। আমি বললাম - মহাভারতে কিন্তু সেই রকম লেখা আছে। বক বললো - শোনো হে ছোকরা, খাঁটি সোনা দিয়ে কি গয়না তৈরি হয়? গয়না গড়তে হলে সোনার সঙ্গে খাদ মেশাতে হয়। তাই যা ঘটে তা দিয়ে গল্প হয় না। গল্প জমাতে হলে সত্যি ঘটনার সঙ্গে খানিকটা ভেজাল দিতে হয়। ব্যাসদেব এটা ভালো করে জানতো। তাই সত্যি মিথ্যে দিয়ে অত মোটা বই খাড়া করেছে। না হলে লোকে পড়বে কেন? তাহলে আপনি ধর্মরাজ নন - আমি বললাম। বক বললে - ঠিক তাই। আমি বক। তবে অন্য বকদের চেয়ে আলাদা। শোনো, তোমায় একটা কথা বলি। এদেশে সব কিছুর সঙ্গে ধর্ম জুড়ে দিলে লোকে খায় ভালো, এ-কথা বুঝে ব্যাসদেব সেটা ভালো করে ব্যবহার করেছে। তাই জন্য ধর্মরাজকে আমদানি করতে হয়েছে। আমি বললাম - তোমাকে মানে আপনাকে বকদা বলে ডাকি। কারণ আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। ঠাকুরদার পর কি ডাকা যেতে পারে আমার জানা নেই। তাই ঠাকুরদার পর সব দাদা হলে ঝামেলা মিটে যায়। বক বললে - তোমাকে আমার খুব

ভালো লেগেছে। আমাকে তুমি করে বলতে পারো। তাহলে কেমন নিজের লোক বলে মনে হয়। আর মন খুলে দুটো কথা বলা যায়। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চৌরঙ্গীতে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাস্তা বন্ধ। বক বললো - কি দেখছো? আমি বললাম - মিছিল যাচ্ছে। তাই গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। এর নাম গণতন্ত্র। কিছু লোক সাধারণ মানুষের দোহাই দিয়ে যখন খুশি রাস্তা বন্ধ করতে পারে তাতে জনসাধারণের যতই অসুবিধা হোক না কেন। বক বললে - গণতন্ত্র কি মাত্র কয়েকজনের জন্য? আমি বললাম - ঠিক তাই। আমার হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে, যেতে পারবো না। আমাকে আত্মীয়ের জন্য রক্ত আনতে ব্লাড ব্যাঙ্কে যেতে হবে, যেতে পারবো না। রাস্তা বন্ধ করার অধিকার শুধু ওদের। আমার রাস্তায় চলার অধিকার গণতন্ত্রের মধ্যে পড়ে না। বক বললে - সত্য, দ্বাপর আর ত্রেতা যুগে এসব ছিলো না। রাজা যা বলতো তাই হতো। আমি বললাম - এখনও রাজা যা বলে তাই হয়। তবে এ রাজা সে যুগের রাজার মতো নয়। আচ্ছা, তুমি যে যুগের কথা বলছো তখন সবাই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো। তা তুমি বাংলা শিখলে কি করে? বক বললো - আমি কলকাতা শহরে কতদিন আছি জানো? সেই সিরাজদৌল্লা যখন কলকাতা আক্রমণ করে তখন থেকে। আমার চোখের সামনে এ শহরটা তৈরি হলো। এতদিন আছি আর ভাষাটা জানবো না? শুনেছি অনেক লোক প্রাচীন কলকাতা নিয়ে গবেষণা করে। আমার চোখের সামনে ইংরেজরা রাজা হয়ে বসলো। আমার কাছে এলে আমি সব বলে দিতে পারি। ওদের এতো পরিশ্রম করার দরকার হয় না। যাকগে ওসব কথা। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক। আমি বললাম - তুমি তো যুধিষ্ঠিরকে খুব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করেছিলে। বক বললো - যুধিষ্ঠির ছোকরা লেখাপড়া মন দিয়ে করেছিল। কিন্তু তীর ধনুক ব্যবহার করার ব্যাপারে একটু গোলা ছিলো। আমি বললাম - সে কি বকদা! তুমি বলছো যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করতে জানতো না? স্কুলে থাকতে আমি মন দিয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়েছি। বড় হয়ে রাজশেখর বসুর মহাভারত অনেকবার পড়েছি। এখনো পড়ি। তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। শুনে খুশি হলাম তুমি যে মহাভারত পড়েছো। আজকালকার ছেলেমেয়েরা মহাভারতের নাম শুনেছে কিনা কে জানে। তাদের মা বাবাদের দৌড় তো টিভি সিরিয়াল পর্যন্ত - বক বললে। আমি বললাম - তোমার মহাভারতের কথা কতোটা মনে আছে দেখি। বলতো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ক-দিন হয়েছিলো? আঠারো দিন - বক বললো। শেষ দিন কৌরব সেনাপতি কে ছিলো - আমি প্রশ্ন করলাম। শল্য - বক উত্তর দিলো। এবার আমি বললাম - তবে? শল্য কার হাতে মরেছিলো? বক বললো - আসল কথাটা ব্যাসদেব লেখেনি। মানে, তুমি বলতে চাও যুধিষ্ঠির শল্যকে হত্যা করেনি? তাহলে আসল কথাটা কি - আমি জানতে চাইলাম। বক বললো - অর্জুন প্রায় শল্যকে মেরে এনে বললো - বড়দা, এটাকে খতম করো। না হলে লোকে বলবে কি? যুধিষ্ঠির শুধু পাশা খেলতে জানে। যুধিষ্ঠির তখন দেখেশুনে আধমরা অজ্ঞান মামাকে যমালয়ে পাঠালো। আমি বললাম - আজকাল পুলিশ একে এনকাউন্টার বলে। দাঁড় করিয়ে মেরে বলে লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে অথবা পালাতে গিয়েছিলো তখন বাধ্য হয়ে গুলি করতে হয়েছে।

বক বললো একটা গল্প শোনো। এ গল্প মহাভারতে নেই। তুমি দ্রোণের পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানো? গাছের উপর মাটির পাখি বসিয়ে তার চোখ টিপ করে তীর মারার কথা, যাতে একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর কেউ পাস করে নি। আমি বললাম - ভালো করে অক্ষর পরিচয় হবার আগে থেকে মার কাছে এ গল্প অনেকবার শুনেছি। বক বললো - পরীক্ষা ফেল করার পর যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা হলো আবার পরীক্ষা দেবার। একবার পাস করতে পারেনি তো কি হয়েছে? দ্রোণ একদম পাত্তা দিলো না। তোমার ওসবে কাজ নেই, বলে ভাগিয়ে দিলো। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলো। দ্রোণ তখন বিরক্ত হয়ে বললো - আচ্ছা, ছ-মাস মন দিয়ে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে এসো। যুধিষ্ঠির নাছোড়বান্দা। ছ-মাস পরে এসে আবার পরীক্ষা দিতে চাইলো। দ্রোণ যুধিষ্টিরের তীর ছোঁড়া দেখে বললো, এখনো সময় হয় নি। আরও ছ-মাস অভ্যাস করে এসো। ছ-মাস পরে যুধিষ্ঠির আবার হাজির। দ্রোণ ভাবলো কি আপদ। যখন পরীক্ষায় পাস করার কোনো সম্ভাবনা নেই, পরীক্ষা নিয়ে বিদায় করে দেওয়াই সঙ্গত। তাহলে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দ্রোণ বললো, বেশ তাহলে পরীক্ষা হোক। ঐ যে গোলাপ গাছে গোলাপ ফুলটা ফুটে আছে ওটাকে এখান থেকে তীর মেরে মাটিতে ফেলো দেখি। আগের বার অর্জুন যা যা করেছিলো যুধিষ্ঠির ঠিক তাই তাই করলো। একটু ঘাস ছিঁড়ে উপর থেকে ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে কত জোরে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে দেখে নিলো। দু-চার বার ধনুকের ছিলা টেনে টং টং আওয়াজ শুনে বুঝে নিলো ধনুকের জোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলো আলো যথেষ্ট কিনা। তারপর গম্ভীরভাবে হাঁটু গেঁড়ে বসে তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলো। দ্রোণ বললো, কি দেখছো? এবার যুধিষ্ঠির জানে কি বলতে হবে। আগের বারের মতো ভুল বলা চলবে না। সে বললো, শুধু গোলাপ ফুলটা দেখছি। দ্রোণ বললো, বেশ তবে তীর চালাও। যুধিষ্ঠির গোলাপ ফুলটাকে ভালো করে তাক করে তীর ছুঁড়লো আর দ্রোণ ওরে দাদারে বলে লাফিয়ে উঠে মাটিতে বসে পড়লো। আর একটু হলে দ্রোণের চোখটা যেত। নেহাত ঠিক সময়ে বাঁ-হাতটা দিয়ে দ্রোণ চোখ দুটো ঢাকতে পেরেছিলো। তীরটা হাত ভেদ করে আর চোখ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। আমি বললাম - এটা নিশ্চয়ই বানানো গল্প। বক বললো - মোটেই নয়। এই রকম আরও অনেক গল্প আছে। ব্যাসদেব কেন যে লেখেনি জানিনা। আমি বললাম - এমনিতে মহাভারত বেশ মোটা। এ গল্পগুলি ঢোকালে মহাভারত নাড়াচাড়া করা প্রায় অসম্ভব হতো। তাছাড়া আরও অনেক পাতা লিখতে হতো। বক বললো - কিন্তু শুনেছি ব্যাসদেব মুখেমুখে বলে যাচ্ছিল আর গণেশ চার হাত দিয়ে রাইটারের কাজ করছিল। আমার বয়স পনেরো হাজার বছর হলো। আর পাঁচ হাজার বছর পরে যখন আমি থাকবো না তখন কি হবে? এ কাহিনীগুলো সব হারিয়ে যাবে? গণেশকে বললেই লিখে রাখতে পারতো। কেন যে এরকম করলো? এই বলে বক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। আমি মন্তব্য করলাম, বকদা, গণেশের সঙ্গে ব্যাসদেবের কি চুক্তি ছিলো আমাদের জানা নেই। তাই ও নিয়ে এখন ভাবার দরকার নেই। আচ্ছা, তোমার সব গল্পগুলি এক জায়গায় করে আর একটা মহাভারত লেখা যায় না? এই সব গল্প লোকে খাবে ভালো। এখন আর রাইটার লাগবে না। একটা ক্যাসেট রেকর্ডার হলেই চলবে। বক খুশি হয়ে বললো - একদিন সময় করে এসো, গল্প করা যাবে।

ভীম আর ঘটোৎকচ লুচি আর আলু ভাজা খেতে বসেছে। হিড়িম্বা ময়দা মাখছে, দৌপদী লুচি ভাজছে। আর জোগান দিতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠছে, এ সব গল্প এখনকার লোকেরা কেউ জানে না।

আমি বললাম - আচ্ছা বকদা যুধিষ্ঠিরকে ঐ সব প্রশ্ন এখন করলে কি একই উত্তর পেতে? বক চুপ করে একটু ভাবলো, ঘাড় ঘুরিয়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বাঁয়ে দেখলো তারপর বললো - আমার তো তাই মনে হয়। উত্তরগুলো যুগের সঙ্গে পালটে যাবার কোনো কারণ দেখি না। তোমার কি মনে হয়? আমি বললাম - মোটেই তা নয়। তোমার প্রশ্ন ছিলো সুখী কে? বক বললো, যুধিষ্ঠির বলেছিলো-

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে সংস্কৃত একেবারে ব্রাত্য। তাই বাংলা করে বলছি। যার কোনো ঋণ নেই, যে নিজের দেশে থেকে সন্ধ্যাবেলায় শাক রান্না করে, সে সুখী। আমি বললাম - এ যুগে এসব অচল। যে লোক যতো ঋণ করে আর শোধ না দিয়ে দিন কাটাতে পারে সে তত সুখী। বকদা, ক্রেডিট কার্ড বলে একটা জিনিষ আছে। এক একজনের বেশ অনেকগুলো ক্রেডিট কার্ড থাকে। তা থেকে অনেক অনেক টাকা ধার করে নানা ফন্দিফিকির করে শোধ না দিয়ে থাকা যায়। তাছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করে শোধ না দিয়ে কতো লোক কাপ্তেনি করে জানো? আর কি বলছিলে প্রবাস? আজকাল প্রবাস বলে কিছু নেই। জেট প্লেনের যুগে দেশ, বিদেশ বলে কিছু নেই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা মহাসুখে সারা পৃথিবীর কতো জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে কোনো সময় ইচ্ছা করলে একদিনের মধ্যে এখানে চলে আসতে পারে। আর যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা কেউ শাক ভাত খায় না। চিলি চিকেন চাউমিনের কথা ভাবা যেতে পারে। বক বললো - এতো কথা আমি জানতাম না। তাহলে তুমি বলো সুখী কে? আমি বললাম - মনে করো আমি যাদবপুরের এইট বি বাস স্টপ থেকে সকাল দশটার সময় পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসে উঠেছি এয়ারপোর্ট যাবো বলে। বাসে লেখা থেকে ৪০+১ জন বসিবেক। কিন্তু কতজন দাঁড়াইবেক বা কতজন ঝুলিবেক এ ব্যাপারে কিছু বলা থাকেনা। বাসে অসম্ভব ভিড়। সাদা চুল দেখে লোকে আমাকে ভিতরে যেতে দিলো। ঠেলাঠেলি করে একটা সিটের সামনে কোনো রকমে দাঁড়ালাম। তখন যাদবপুর থানার কাছে প্রায় এসে পড়েছি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ সিটের লোকটা উঠে দাঁড়ালো নামবার জন্য আর আমি ধপ করে বসে পড়লাম। সেই মুহূর্তে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক। বক বললো - সে না হয় বুঝলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তোমাকে তো বাস থেকে নেবে পড়তে হবে। আমি বললাম - ঠিক কথা বলেছো। যদি পাঁচ বছরের জন্য সুখী হতে চাও তবে আইনসভার সদস্য হতে হবে। ভালো মাইনে। দায়দায়িত্ব তেমন নেই। তাছাড়া কলাটা, মুলোটা তো আছেই। গলার

আর গায়ের জোর থাকলে খুব ভালো। যখন দলের কর্তা, যাকে হুইপ বলে, হাত তুলতে বলবে তখন হাত তুলবে। চেঁচামেচি, মারামারি, টেবিল চেয়ার ভাঙা ইত্যাদি নির্দেশমতো করতে পারলে আরও পাঁচ বছরের জন্য সুখী হওয়ার টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। বক জানতে চাইলো - তারপর? আমি বললাম - পাঁচ দশ বছর পরে সুখের নতুন সংজ্ঞা হবে। তখন সেইমতো সুখের সন্ধান করতে হবে। বক বললো - এরপর যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম - আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির বলেছিলো -

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।।

বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায় - প্রাণীগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সকলে চিরজীবী হতে চায়। আমি বললাম - একদম বাজে কথা। এখন কেউ এ সব ভাবে না। বরং ভাবে, যে কদিন আছি পিটিয়ে খেলে যাব। একেবারে টুয়েন্টি টুয়েন্টি খেলার মতো। বক বলল - তাহলে তোমার মতে আশ্চর্য কি? আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম - ঐ দূরে রাস্তায় ছোটো ছোটো লাল বাসগুলো দেখতে পাচ্ছো? তার পিছনে কি লেখা আছে বলতে পারো? বক চোখ কুঁচকে বাসের দিকে তাকিয়ে বললো - আমার বয়স হয়েছে। অতদূর দৃষ্টি যায় না। তুমি বলে দাও। আমি বললাম - বাসগুলো পিছনে লেখা আছে ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। বক বললো - কিছু বুঝলাম না। আমি বললাম - এই কলকাতা শহরে কেউ ট্রাফিক আইন মানে না। যে যার ইচ্ছামতো গাড়ি চালায়। তারমধ্যে প্রথম স্থানে আছে এই মিনিবাস। তারা অন্যকে জ্ঞান দিচ্ছে আইন মেনে চলতে। এর চেয়ে আর আশ্চর্য কি হতে পারে? বক বললে সন্ধ্যা হয়ে এলো। এবার আমাকে আমার আস্তানায় ফিরতে হবে। আমি জানতে চাইলাম - রাতে তুমি কোথায় থাকো? বক জানালো - আলিপুরের চিড়িয়াখানাতে আমার থাকার একটা ভালো জায়গা আছে। আমি বললাম - তোমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর জেনে নাও। তুমি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলে পন্থা কি? বক বললো - সত্যি তুমি মহাভারতটা খুব ভালো করে পড়েছিলে। যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলো -

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।

এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, সাধু জন বা জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে পথে যায় সেটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমি বললাম - বকদা, জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা মতো দার্শনিক হয়ে হাঁটলে কলকাতার খোলা ম্যানহোলে তোমাকে পড়তে হবে। শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলা। বাড়িতে

একরকম, অফিসে অন্যরকম, ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আরেকরকম এই হলো শ্রেষ্ঠ পন্থা। বক বললো - তার মানে অফিসে সিংহ, বাড়িতে মেষ। আমি বললাম - অনেকটা তাই। এ ছাড়া নানা রঙের জামা রাখতে হবে। লাল, সবুজ, গেরুয়া যখন যা সুবিধা সেটা পরে আমি তোমাদের লোক বলে তাদের সঙ্গে গলাগলি করতে হবে। এমনকি জামার একদিক লাল আর উলটো দিক সবুজ হতে পারে। তাহলে দুটো জামার দরকার হবে না। সময়মতো উলটে পরলে চলবে। বক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। আজ এই পর্যন্ত থাক। আসি তাহলে। পরে আবার দেখা হবে। ভালো থেকো।

Subrata Ray
34 Malakarpara Road, Flat 2D
Purbasa Apartment
Kolkata – 700 038
Phone: 24006625/24008598